শহুরে বুদ্ধিজীবী বনাম ঝাড়খণ্ডী বিপ্লবী লোকসঙ্গীত

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

দামোদর, কংসাবতী সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, বৈতরণী, বুড়াবালাম, কোয়েল, কুইলী, কনহর, কারো, অজয়, ময়ূরাক্ষী, বরাকর বিধৌত একটি সুস্পষ্ট বিশাল ভূখণ্ড যা মূলত প্রাচীন গণ্ডোয়ানার একাংশ তারই ঐতিহাসিক নাম ঝাড়খণ্ড। একদা নাগদেশ এবং দশারণ্য নামে খ্যাত এই বিশাল ভূখণ্ডের একদিকে রাজমহল পর্বতমালা, মধ্যভাগে দুমকার হিজলা, রাঁচীর জনা - জারজারগা, চাঁদোয়া, বড়গড় ও পালামৌর পাট। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডীর অযোধ্য পাহাড় ও সিংভূমের দালমা, কিরিবুরু, রায়রঙ্গ পুরের বাদাম পাহাড় একেবারে এক মধ্যভাগে। অন্যদিকে ময়ূরভঞ্জের সুবিশাল শিমলীপাল পাহাড়। বাঁকুড়া, শুশনিয়া, আর পুরুলিয়ার পাঞ্চেত যে এর ভিত্তকে শক্ত করেছে।

খড়গপুরের কাছে সমতল বাংলার যেখানে শেষ, সেইখান থেকেই শুরু ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির করম বা করমা নাচ ও সুরের গুঞ্জরণ, শেষ তার রায়পুর পালামৌতে। সাঁওতাল পরগনার গোড্ডা থেকে শুরু করে ময়ুরভঞ্জ - কেঁওঝোরের প্রত্যন্ত গ্রামে টুসু বা সোহারাই সুরের অনুরনন। দাঁসাই, সোহরাই, নওয়াখিয়া, বাহা, শারুল, জিতুয়া, রজঃ উৎসব ও সুরের মাদকতা; চো, পাঁতা, ভুঁয়াঙ্গ, নাটুয়া, ডাহের, পাইক নাচের দীপ্ত পদক্ষেপ; ঢাক, ঢোল, ধমসা, মাদল, বাঁশি, তুরুধুতু, সোহনাই, রামসিংদা, রেগড়াটামাকের বাজনাতে এবং ডোমকোচ ও ঝুমুরের মূর্ছনাতে উদ্বেলিত হয় এই অঞ্চলের মানুষ।

ভারতীয় উপমহাদেশ এই বিশাল ভূখণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যারা, তাঁহা হলেন — সাঁওতাল, ভূমিজ, মুদি, রাজোয়াড়, দেশওয়ালী, মুণ্ডা, ওরাঁও, মাল, মহলা, লোধা, খেড়িয়া, চিকবড়াইক, অসুর, আহীর, বাগাল, মাহাত, নাগেশিয়া, কোরোডা, বীরহোর, বাউরি, হাড়ি, ডোম, মুচি, খাসি, প্রদান, বেনে, শুঁড়ি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, রাজপুত, ভুঁইয়া, ভঞ্জ - পুরাণ, কারণ, খণ্ডায়েত প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর বহু মানুষ। ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজনে আজ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিহার, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক সীমানাতে বিভক্ত। কিন্তু ভূ - প্রাকৃতিক অবস্থান, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যকে ধরে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলটিকে ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতিক্ষেত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে।

কলকাতা, পাটনা ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রিক তথাকথিত 'সংস্কৃতিবান' শিল্পী, গায়ক, আবৃত্তিকার, সিনেমা পরিচালক, নাট্যকার, লেখক, কবি যাঁরা মহাশ্বেতা দেবীর ভাষাতে অনেকেই 'কালচারাল ভাইরাস' তাঁরা বাণিজ্যিক প্রথা ও পদ্ধতিতে হজম করে মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরমপ্রাপ্তি বলে 'সার্থক রূপকার' হিসাবে চিহ্নিত হন। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির যৌথ কর্মপ্রেরণা, গোষ্ঠীসত্তার উপরে উঠে আঞ্চলিক সংহতির যে সামগ্রিক সৃষ্টি যাঁরা তিল তিল করে জন্ম দিয়েছেন, সগর্বে লালান করে যা এক বহতা স্রোতের মতো রেখেছেন, সেই পরম্পরাগত মূল্যবোধকে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। গায়কী ঢং, উচ্চারণ ভঙ্গি তথা বিষয়বস্তুর গভীরে না গিয়ে শহরজীবনে লালিত - পালিত মানুষজনের কাছে যা পরিবেশন করেন তাই নগরকেন্দ্রিক শ্রোতাদের কাছে নূতন ও অভিনব বলে মনে হয়। লোকায়ত সংস্কৃতির থেকে বহু দূরে থাকা এই মানুষগুলো কোলকাতার শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে ঐ সমস্ত শহুরে শিল্পীদের বিকৃত ও যান্ত্রিক পরিবেশনাকে বাহবা দেন। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের প্রভাবে, সর্বৈব নিয়ন্ত্রিত কোলকাতার নগরমনস্ক মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা তাই আজ 'ব্যক্তি' সুরকার, গায়ক, তথা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বাহবা দেন। প্রেক্ষাগৃহের একটি টিকিট সংগ্রহ করা স্ট্যাটাস হয়ে দাঁড়ায়।

রেডিও মারফত্ কোন নাটকে 'বটেক' শব্দ সম্বলিত নাটক শুনে আদিবাসীদের সম্বন্ধে তীব্র এক হাস্যখোরাকযুক্ত আকর্ষণ খুঁজে পান। অন্যদিকে আকাশবাণী - খ্যাত তথা অন্যান্য বিশিষ্ট আবৃত্তিকারেরা কবিতা পাঠ করেন আবৃত্তি করেন না সেগুলো কবিতা, না সঠিক ঝাড়খণ্ডী কথ্যভাষা। অথচ ব্যবসায়িক সাফল্যের আনন্দে এরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমের ভাষাকে ব্যঙ্গ করেন। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা 'কিউরিয়োবস্তু' শুনে হাততালি দিয়ে আবৃত্তিকারকে অভিনন্দন জানান। মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' থেকে শুরু করে শান্তিগোপালের 'কালপুরুষে' এই চিন্তাভাবনা। 'কিউরিয়ো হান্টিং' মনোবৃত্তি আজ শহুরে মানসিকতার তথাকথিত সংস্কৃতিবান মানুষের ''ইগো স্যাটিশ্ ফ্যাকশন'। তাই আকাশবাণীর বসু - ঘোষেরা আঞ্চলিক কবিতার আসরে বাজার মাৎ করেন। এন. এফ. ডি. সি. ও. ফিল্ম ডিভিশনের দৌলতে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মাধ্যমে 'বিপ্লবিক' চিন্তা ধারার লেখক কলাকুশলীদের অনেক 'কুলীন' প্রগতিবাদীরা দিব্যি করে খাচ্ছেন। ডোকরা, বাঁকুড়ার ঘোড়া, ছৌ -এর মুখোস ড্রইংরুমের শোভাবর্ধন আর করছে না। ক্যামেরা নিয়ে কাকমারাদের পিছনে তথা আদিবাসীদের পিছনে শহরের 'বাবুরা' গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন। কৃষক উচ্ছেদ, জমি হড়প, মহাজনী শোষণের পর শিল্পকর্মের নামে এ এক নূতন উপদ্রব। টেপরেকর্ডার আরও ভয়াবহ। গ্রামের সাধারণ অজ্ঞ অধিবাসীর সামনে ঐ যন্ত্রটি চালিয়ে বাবুরা গান রেকর্ড করে তাদের শুনিয়ে নিয়ে এলেন শহরে।

হঠাৎ রেডিওতে শোনা গেল ঐ গানের কথাগুলো নিয়ে কলকাতার গায়কী ঢং-এর, সুরের মধ্যে একটু হের-ফের করে অনেকেই হয়ে যাচ্ছেন প্রসন্ন চিত্ত সুরকার, গীতিকার ও গায়ক। রেকর্ড রোম্পানীগুলির শহরের মানুষের চাহিদা বোঝেন। রেকর্ড করা জন্য তাঁদের বহু সুন্দরীর ভিড় সামলাতে হয়। কর্তৃপক্ষের পেয়ারের লোকেদের দিয়ে গান রেকর্ড করে তাঁরা বাজার মাৎ করেন। অনেক সময় কত মর্মান্তিক ইতরামি ঘটে তা আর নাই বা লিখলাম। তাদের দেখারও সময় নেই কিভাবে কোন চক্রবর্তী মশাই সুরকার, গীতিকার, গায়ক হিসাবে ঝাড়খণ্ডী মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করলো। কিংবা টুসু - লৌকিক দেবীকে 'ছুঁড়ি' বলে টুসুর ভাবমূর্তিকে হেয় করলো। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঝাড়খণ্ডী মানুষজনের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্পের নামে বাণিজ্যিক পণ্যের রমরমা 'নিউ মার্কেট'। মানুষগুলো কেমন ভাবে আছে তা দেখার সময় নেই কারুর। পাতাল রেলে কর্মরত পার্কস্ট্রীটের কাঁশডুংরীতে মাহাত ও সাঁওতাল পল্লীতে এরা কেমন আছে তা দেখারও এদের ফুরসৎ নেই। অর্থাৎ চিরকালীন উদ্ধৃত শ্রমিক ঝাড়খণ্ডী মানুষদের সম্বন্ধে অনীহা বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে এদের শিল্প - উৎকর্ষগুলিকে যত তাড়াতাড়ি নিজেদের কোম্পানীর 'কবি - রাইট' অধিকারে আনা যয় ততই মঙ্গল। আদিবাসী, মুলবাসী ঝাড়খণ্ডের মানুষের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের সাংস্কৃতিক 'ভাইরাস'দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে লাগলেন, তাঁরা চিহ্নিত হলেন ''বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসাবে।

২.

এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র লোকসঙ্গীতের বিপ্লবী রতিরোধের কথাই আলোচিত হবে। যেখানে ঝাড়খণ্ডের মানুষ গেয়ে উঠত :

ডুংগুরীর উপরে কেরে ঝাঁটি কাটে ?
হামি বঠি গো নাগবংশী রাজার বেটা
সরু দাতন কাটি।

গায়ক - গোকুলচন্দ্র মুণ্ডা
গ্রাম - চালুনিয়া
পোষ্ট - কেন্দাডাংরা
ভায়া - চাকুলিয়া
জেলা - সিংভুম, বিহার

অন্যদিকে রাজাদের প্রতি আস্থা নিয়ে পরম্পররাগত ট্যাঁড়গীত তারা গাইত :

জায়ুথিলি কেঁন্দুঝরি
কেন্দু পাচি ছিল গণ্ডাচারি
মুই সেই কেঁন্দু লেঁই
রাজাকু ভেঁটালি।

গায়ক - সনাতন পাতার
গ্রাম - রিমিল
পোষ্ট - চম্পুয়া উড়িষ্যা

আবার আরও একিট ট্যাঁড় গীত:

ই ডুংরী ই ডুংরী
পিয়াল প্যাকেছে।
বেধুয়া শালা খ্যাদ্য ভরা
হামকে ভেলকাছে

গায়ক - রবি লোচন পাতর
গ্রাম - ভাকুয়াড়ি
পোস্ট - সোনাহাতু
জেলা - রাঁচী, বিহার

ইতিহাসের নাগবংশী রাজাদের বংশধর মুণ্ডা ও ভূমিজরা জঙ্গলে আর সরু দাতন কাটতে পারছে না। শাল জঙ্গল শেষ হতে চলেছে। কেঁন্দু পাকা ফল নিয়ে রাজার দরবারে যাওয়ার সরলতা হারিয়ে গেছে কবে। পিয়ালের টক - মিঠা স্বাদ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আদিবাসী ও কৃষকদের জঙ্গল কেন্দ্রিক অর্থনীতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। জঙ্গলে নতুন গাছের নতুন আইনের আমদানী করেছে বনবিভাগ।

ইউক্যালিপটাস আর সোনাঝুরি। সরকারী ভাষ্যে সোনার গাছ। পাঁচ বছরের মধ্যেই সাইজ করে কেটে খুব সহজেই শহরের কাগজ কলগুলিতে পাঠাতে পারা যায়। একচেটিয়া ধনী ও পুঁজিপতিদের কাছে সোনা এই গাছ। অথচ আদিবাসীদের কাছে এই গাছের কোন মূল্যই নেই। পাতাগুলি জ্বালানি শুধু করতে পারে তারা। অথচ শালগাছের শালপাতা, শালধুনো, শাল দাঁতন, আর কেন্দুফল। পিয়াল, মহুয়া, হরিতকি, বহড়া, আমলকি, করঞ্জ, নিম প্রায় শেষ। অথচ দ্রুত বর্ধনশীল ইউক্যাপিলটাস ও সোনাঝুরি গাছগুলো আসলে মরুভূমির গাছ। সামান্য জল পেলেই তা বড় হয়ে উঠে। মাটির সামান্য আর্দ্রতাও তারা শুষে নেয়। ফলে ঘাসও জন্মায় না ঐ গাছগুলির নিচে। তাই ঝাড়খণ্ডী কবি গান বাঁধলেন, সুর দিলেন প্রচলিত ঝুমুরের সুরে। যেন গণসঙ্গীতের আরেক রূপ :

ইউকিলিপিটি গাছ, সেই গাছ মহাগাছ
শুষি লেলা, শুষি লেলা গে ধনী
মাটিকেরী রস, সেতো শুষি লেলা।
আকাশমণি সোনাঝুরি
তর ল্যাগে গড় করি, মরি গেলা
মরি গেলা গে ধনী, ছেড়ি কেরী ঘাস
সেতো মরি গেলা।
কেঁন্দ, পিয়াল শেষেঁই ভেল
মহুল, কুসুম কাটি লেল
ফরেস্টারে, করেষ্টারে টাকাই দলান দেলে।
পশুয়াক নিবেদন, শুন শুন সর্বজন
হামাদের জঙ্গল রাখতে
কাঁড়ে বাঁশে চড়াও হে পাটন
হামাদের শরম রাখতে

গায়ক কর্মবীর মাহাত
গ্রাম - জামবাদ
পোষ্ট - বালকডি
জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ ও সুগায়িকা অধ্যাপিকা বীণাপানি মাহান্ত এবং ঝুমুরের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গিরিশ চন্দ্র মাহান্ত মনে করেন ঝুমুরই এ অঞ্চলের প্রাণ ও জীবনীশক্তি। অধ্যাপিকা মাহান্ত বলেন —''হরিয়ানার রাগিনী, পাঞ্জাবের টপলা, রাজস্থানের মন্দ, জম্মু-কাশ্মীরের ডোগরী, উত্তরপ্রদেশের চৈতী ও কাজরী, উড়িষ্যার সম্বলপুরী এবং বাংলার ভাটিয়ালীর মতই ঝাড়খণ্ড ভূমিও এর ঝুমুর সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। ... বছরের মধ্যে দু-বার চাষের অসুবিধার জন্য এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু ঝুমুর এইসব মানুষদের জীবনে দৈব আশীর্বাদের মতো কাজ করে এবং এইসব গরীব দুঃখী মানুষদের বন্ধ্যাভূমি। দারিদ্র্য এবং জীবন

যন্ত্রণার সব রকম অভিশাপ ভুলিয়ে দেয়—। ঝাড়খণ্ডের জনপদবর্গের কাছে ঝুমুর যে জীবন - রক্ত বিশেষ — একথা বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।" (১৯৭১)

তাই আমরা দেখি এই ঝুমুর গানের মাধ্যমে এই এলাকার উদ্ধৃত্ত শ্রমিকেরা আসামে কুলী চালান যাবার সময় যে গান বেঁধেছিলেন তা একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদের ইঙ্গিত, অন্যদিকে গানটি এখনও আসমের চা - বাগান, উত্তবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চল এবং কুলিদের মূল বাসভূমি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও সমানভাবে জনপ্রিয়।

চল মিনি আসাম যাব, দেশে বড় দুঃখের
আসাম দেশের মিনি, চা - বাগান হরিয়াল।
কোদাল মারা যেমন তেমন, পাতা তুলা কাম গো,
হায় যদুরাম ফাঁকি দিঁয়ে পাঠালি আসাম।
এক পয়সার পুঁঠিমাছ, কয়া তেলীর তেল গো,
মিনির বাপে মাঁগে যদি আরই দিব ঘোল গো।
ছ্যালা কাঁদে টিহির টিহির, গাগরীয়ে জল নাই
বাপ-দাদারে বাঁঞ্ছা মুরলী বাজায় রে।
সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে ধরি আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম, রে যদুরাম।

সংগ্রহ ও গায়ক — কালী দাসগুপ্ত
২/৪, একডালিয়া রোড, কলিকাতা ২৯

সেদিন ''দুভিক্ষ'', ''অনাবৃষ্টি'' আর খাদ্যাভাবের জন্য শিশুকন্যা 'মিনি'র হাতধরে বহু মানুষ ঘর ছেড়েছিল আসামের উদ্দেশ্যে। নব অভিবাসনের নেশাতে পাগল এরা সেদিন (১৯২১ পর্যন্ত) মোট দেশান্তরী হয়েছিল —৯ লক্ষ ৭০ হাজার। ঝাড়খণ্ডের মানুষ 'বাবু', ''সাহেব'', 'সর্দার'' তথা আড়কাঠিয়া ''যদুরামের'' উপর যে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিল, তার অণুরণন আজও শুনতে পাওয়া যায়। বাবু, সাহেব, সর্দার, যদুরাম-এর যৌথ প্রতীক কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে বিবর্তিত হয়েছে বাঙালি উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতির বিরুদ্ধে

পুরলিয়ার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষসহ সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আজও মানুষের কাজ জুটে না। ঔপনিবেশিক, অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ তথা প্রচার মাধ্যমগুলির সাঁড়াশি চাপে তারা দিশেহারা। কিন্তু শুধুমাত্র দরিদ্র মেহনতী মানুষের স্বার্থে তারা গাইলেন ঃ

মুলুকে নাহি মিলে কাম, কৈসে বাঁচে প্রাণ,
সাঁঝে খ্যালে বিহানে হয় টান।
পরের ঘরের পর খাটালি, সকাল হলেই
যাই বাগালী রে,
খ্যাটে খ্যাটে পিঠে বহে ঘাম
কৈসে বাঁচে প্রাণ।
আষাঢ় শরাবন মাসে
চাষাই করে খাঁজাখুঁজি রে
আশ্বিন মাসে বলে ভাইরে
কেহ কারু হলে।
নওয়াগড়ের কুটুম অ্যাল
খাওয়া দাওয়া সরে গেল রে
মাড় বাতে রাখলই মান।
যাও ছিল গুঁড়ি গাঁড়ি
তাও লিল মহাজনেরে
খ্যাড়ে বসে ঝুরত নয়ান।

সংগ্রহ ও গায়ক - লেখক

একটি 'ভুথি' অর্থাৎ 'ভাতুয়া' (Bonded Labour) মেয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিলো। সে রাতে দেখতে পায়না, ঢেঁকিই তার কাছে সবচেয়ে কাছের। তার পরণে একটাই ছেঁড়া টেনা অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো। রাঁচি জেলার সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সংগৃহীত একটি গান—

নিহুড়ি নিহুড়ি ডাণ্ডা টুটি
রে ভুথি, কেতিখন ছুটি।
বুন দেলও ঝুলুর ধান
ঝাড়তে খামারে বান, রে ভুথি।
ঢেঁকীরে ঢেঁকী ভাচ্যা
আর ভ্যাচা খ্যাটে মারি
ধান সিজা, ধান সুখারে ভুথি
রোদপানি র‍্যাতকানা
কেমন সুখাব টেনা
সবরনেখায় সিনান করি রে ভুথি।

সংগ্রহ ও গায়ক - লেখক

কলকাতার তথাকথিত গবেষক/ অধ্যাপক/ পণ্ডিতেরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝেই এমন সব উক্তি ও ব্যাখ্যা করেছেন, এই অঞ্চলের সংস্কৃতি নিয়ে যে পুরুলিয়াবাসী হিসাবে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। আমার কারুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রাগ বা আক্রোশ নেই। অ্যাকাডেমিক বিতর্কের খাতিরেই এই বিষয়ের অবতারণা। 'বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড গীত, নৃত্য' গ্রন্থে ডঃ

আশুতোষ ভট্টাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত (১৯৬৫) মন্তব্য করেছেন ঃ ''কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ের অংশগ্রহণ করিবার কালে, পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজ স্বভাবতই মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে' (পৃষ্ঠা - ৭৭১)। এই উক্তি সমগ্র পুরুলিয়াবাসী কেন সমগ্র মানব - সমাজের কাছে অপমানকর। আর এত বালখিল্য মন্তব্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কলম দিয়ে বেরুবে সেটা ভাবলে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন - পাঠনের মান ভাবতে কষ্ট হয়। এতে গেল ছো - নাচের কথা। 'বাঁন্দনা' বা 'সোহরাই' উৎসব ঝাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য গোরু ও মোষকে বন্দনা করা। নাচ-গান, হাঁড়িয়া, দেওয়ালচিত্র আঁকা সব মিলিয়ে এক দারুণ উত্তেজক ব্যাপার। কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাকথিত ঐ পণ্ডিত ব্যক্তিটি ঐ পুস্তকেই লিখলেন— ''এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ কিংবা ষাঁড়কে বাঁধিয়া তাহাকে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্বে এইভাবে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ইহাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হইত। বর্তমানে লাঠি দিয়া খুঁচাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।'' (পৃষ্ঠা - ২২৪) ঐ অঞ্চলের মানুষ মৃগয়াজীবী থেকে চাষি হিসাবে যখন নিজেদের উত্তরণ ঘটালেন তখন থেকে চাষের জন্য গরু বা মোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরে তারা 'কপিলা মঙ্গল' নামে মৌখিক ভাবে প্রচলিত গান সমূহের জন্ম দেয়। আর গোরু এবং গাভী সৌভাগ্যের প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি আবার বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলউইনের সঙ্গী হিসাবে নিজেকে নৃবিজ্ঞানী মনে করেন। আর তাঁর এই গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের বাংলা বিভাগের পাঠ্যপুস্তক। অন্যদিকে আরও একজন গবেষক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''বাংলোর লোক উৎসব; তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সম্বল'' প্রবন্ধে পুরুলিয়ার ভাদু উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা কালে বৈজ্ঞানিক চিন্তন ও মনন থেকে সরে গিয়ে লিখেছেন ''গোটা ভাদ্রমাস নৃত্যগীতে উৎসব পালন করে ভাদ্র মাসের শেষদিন সারারাত নৃত্যগীত অনুষ্ঠান 'জাগরণ' পালিত হয়। জাগরণের অনুষ্ঠানকালে সমবেত নর - নারীরা অবাধ মেলামেশা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন শিথিলতাও পরিদর্শিত হয়।'' বর্তমান প্রবন্ধের লেখক নিজে পুরুলিয়াতে লালিত ও পালিত। আমার গ্রামেও ভাদু উৎসব হয়। কিন্তু ভাদু - উৎসবে অবাধ মেলামেশা করার আবিষ্কারটি একেবারে কিউরিয়ো চিন্তাভাবনা প্রসূত এবং ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিকৃতরুচি ও নিম্নমানের চিন্তারই প্রতিফলন। (লোকায়ত সংস্কৃতির, পরিপ্রেক্ষিত ও রূপরেখা পৃষ্ঠা -১১৫, সম্পাদনা সঞ্জীব সরকার/ অরুণ রায়, ১৯৭৮) । ঐ পুস্তকেই আরও একজন গবেষক বলেছেন— ''নৃত্যটির নাম ছৌ নৃত্য, ঝাড়খণ্ড তথা রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এই নাচ।'' কিন্তু আসলে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হওয়ার জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতোই তিনিও নাচের নাম ছো-কে পাল্টে 'ছৌ' করলেন। ছো নাচের রঙ ঝুমুরটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে না পেরে খাপছাড়া চারটি পংক্তি উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে :

সকল সিদ্ধিদাতা, জয় হর গৌরীর নন্দন
কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্র গমন, বিঘ্নবিনাশন।

কিন্তু আসল গানটি হলো :

সিঁন্দুর বরণ অঙ্গ, মুষিক বাহন
সকল কর্মের সিদ্ধিদাতা, জয় হর গৌরীর নন্দন
কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্র গমন, নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ।

আসলে দীর্ঘদিন কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ না করে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণের প্রথাগত ও পদ্ধতি না জেনে সাংবাদিক সুলভ মনোভাব নিয়ে কোন কিছু লেখার লোভ যাঁরা সামলাতে পারেন না তাঁরাই মেকি - গবেষক।

বস্তুত এত কথা বলার কারণ হলো ঝাড়খণ্ডী ঝুমুরের কিংবা কোন লৌকিক সুরের সঙ্গে নাচ ও গান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আচার - অনুষ্ঠান এমন মিলে - মিশে আছে যে বহিরাগত গবেষকেরা ভুল করতে বাধ্য। তাঁরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন দোভাষীর মাধ্যমে, কাজেই স্থানীয় বাংলার উচ্চারণভঙ্গি তাঁরা দু-এক দিনের সরেজমিন তদন্তে রপ্ত পারেন না। ফলে বাংলা হরফে লেখার সময় তাঁরা স্থানীয় উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক ঝাড়খণ্ডী শব্দগুলি লিখতে পারেন না। লিখলেও অর্থ বুঝতে পারেন না। যেমন —চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় তাঁর 'বাংলার পল্লীগীতি'' গ্রন্থে লিখেছেন :

আমি যে যাতে ছিলি কুলি বল কুলিরে
বাবুহো, তহর গাইয়া ডাকয়ে ঘুরাই।

অর্থ হিসাবে লিখলেন—আমি যখন কুলি খাটতে যাচ্ছিলাম তখন তোমার গাইটি আমাকে ডাকলো। কিন্তু সঠিক অর্থ হচ্ছে — আমি যখন গ্রামের রাস্তায় (কুল্‌হি) দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তোমার গাইটি আমাকে ডেকে ঘুরালো। সঠিক উচ্চারণযুক্ত শব্দগুলি না লিখতে পারার জন্য পুনরায় উচ্চারণ করার সময় যান্ত্রিক উচ্চারণ করেন ভীষণ কষ্ট করে। যা ঝাড়খণ্ডী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত। সহজাত উচ্চারণকারী ঝাড়খণ্ডী গায়কেরা রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোনকোম্পানী, সিনেমার সঙ্গীত পরিচালকদের 'চক্রের' মধ্যে স্থান করে নিতে পারেন না। যখন কেউ কেউ বা ঐ 'চক্রের' পাশাপাশি আসেন তখন দেখতে পান, বিকৃত উচ্চারণকারী, যান্ত্রিকতাসর্বস্ব শহর - সংস্কৃতির মানুষেরা তাদের গলাতে গ্রাম্যতার শহুরে চমক এনে বাজার 'দখল' করে রেখেছেন। মুখে এদের প্রগতির খৈ ফুটে, হাভানার যুগ উৎসবে গিয়েই কেউ কিউবার লোকসঙ্গীত শিখে আসেন; একই ব্যাক্তি একই সঙ্গে ঝাড়গ্রামে ৮ বৎসর, পুরুলিয়াতে ৫ বৎসর বাঁকুড়াতে ১০ বৎসর থাকার হাস্যকর দাবি উত্থাপন করেন। এরা সুর চেনে, বোঝে, গলাতে সূক্ষ্ম রস আছে, কিন্তু গ্রাম্যতা নেই। কোলকাতার সুধী দর্শক ও শ্রোতারা লক্ষ করবেন এই সমস্ত লোকসঙ্গীত গায়কেরা কোন দিনই কিন্তু মূল শিল্পীদের অর্থাৎ যাঁদের কাছ থেকে শহুরে শিল্পীরা টেপ করে আনে, তাঁদের নাম বলেন না। বললেও এমনভাবে বলেন যে তাঁরা যেন মানুষই নন। বললে কোলকাতার শ্রোতারা মূল - গায়কদের কাছ থেকে গান শোনায় আগ্রহী হবেন। গ্রামীণ শিল্পীদের পরিচিতি বাড়ুক এটা এরা চান না। পরম শ্রদ্ধেয় লোকসঙ্গীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয়ের অভিজ্ঞতা এখানে স্মরণ করা দরকার:

'পল্লীগীতি গাইতে গিয়ে উচ্চারণের ব্যাপারে কঠিন বিতর্কের সম্মুখীন হতে হল। অবশেষে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর সাথে পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই ভনিতা না করেই আঞ্চলিক গীতের উচ্চারণ সমস্যাটা তুলে ধরলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমার মতামতটা কি? ভাষাবিদ আমি নই, সঙ্গীত - শিল্পী হিসাবে সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করলাম। আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গী লোকসঙ্গীতের অভিব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি ভাবি এবং ভাবের integration এর জন্য এটা অপরিহার্য মনে করি। সেজন্য আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গী নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করার আমি পক্ষপাতী। তাকে ভদ্রায়িত করতে গেলে অভিব্যক্তির authenticity নষ্ট হয়ে যাবে।'' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস, , লোকসঙ্গীত সমীক্ষা — বাংলা ও আসাম পৃষ্ঠা ১০২, ১৩৮৫) বলা বাহুল্য ভাষাচার্য সুনীতি বাবু হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয়কে সমর্থন করেছিলেন।

লোকসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ কালী দাশগুপ্ত মনে করেন : ''শব্দ আর নিঃশব্দতা মিলিয়ে সঙ্গীত। অতি দীর্ঘ

প্রক্রিয়াতে এটা গড়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর তাগিদে form কিভাবে বদলাবে সেটা স্থির করতে পারে তারাই যারা ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।"

অর্থাৎ গ্রামের মানুষ না হয় এমন কেউ যে দীর্ঘ দিন তাদের মধ্যে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাষাতে কথা বলে, গান গেয়ে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছে। এই যে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, ঝুমুর ইত্যাদি form গুলো, এগুলো বিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছে। বাউলের কথাই ধরুন। এর form টা ছিল ঝুমুর। তারপর নতুন কথা বলার তাগিদে, নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তার form টা বদলেছে। জিনিসটা কি ভাবে হয়? কিছু এগিয়ে থাকা লোক তাদের ভাবনাচিন্তা মতাদর্শ এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সেটা করতে গিয়েই form টা ভাঙ্গে। কিন্তু যেহেতু সেটা গ্রামের মানুষের ভিতরের থেকে হয়; কেউ বাইরের থেকে সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় না। তাই নূতন form টাকে গ্রহণ করে নেয় তারা। সেই form টা আবার পরিস্থিতি অনুসারে বদলে যায়। কিন্তু 'ভাঙতে হবে'— এই idea থেকে আমরা শহুরে মধ্যবিত্তরা form ভাঙতে শুরু করে দিলাম। এটা বোধহয় ঠিক পন্থা নয়। গ্রামের মানুষকে, তার সমাজকে, তার ইতিহাসবে যখন বুঝতে পারব, এটা এখনো মূলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, এখনো সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারাটাই প্রধান, তখন এটা করার অধিকার জন্মাতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের message গ্রামের মানুষের কাছে তার ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সব থেকে দুঃখের কথা, এ ব্যাপারটা আমরা বুঝি না, কিন্তু বুর্জোয়ারা বোঝে।... জনগণে মধ্যে হোক, তাদের সুর, ভাষা আয়ত্ত করলে তবে নূতন content দিয়ে নূতন গান রচনা করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ ব্যাপারটা ধর্ম ব্যবসায়ীরা বোঝেন, এই প্রক্রিয়াটি কাজে লাগান। কিন্তু বিপ্লবীরা বোঝেন না, কাজে লাগান না।" (প্রস্তুতিপর্ব, পৃষ্ঠা ৫১-৫২, জুলাই - অক্টোবর' ৮১) তাই দেখি 'আকাশবাণী' ও রেকর্ড কোম্পানীগুলিতে ''গীতিকার'' যাঁরা তাঁরা বেশিরভাগই কোলকাতার লোক।

এরা কোলকাতাতে থেকে গ্রামজীবনের সুর - বাহার সম্পর্কে 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে কিছু কেতাবি ধ্যান - ধারণা নিয়ে, সর্বসাকুল্যে ১০০ টি গ্রামীণ শব্দ জেনে মাটির কাছাকাছি যাবার আকুল অভিনয় করেন। আকাশবাণীর আইন অনুসারে ''অ্যাপ্রুভড্'' গীতিকার হয়ে লোকগীতের দোকান খুলে বলেন। ক্রেতাও জুটে যায়। শহুরে লোকসঙ্গীত - শিল্পীরা তাদের গান নিয়ে, যান্ত্রিক উচ্চারণ ও বিকৃত সুরে আকাশবাণী মারফত সেই লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রশ্ন জাগে সেটা লোকসঙ্গীত না অন্য কিছু। এ বিষয়ে আকাশবাণীর কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। আর আকাশবাণীর তথাকথিত 'অডিশন' পরীক্ষাতে গ্রামীণ শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করা হয় প্রথমেই যে তিনি কোন স্কেল-এ গাইবেন। গ্রামীণ শিল্পী প্রথমে চমকে যান যখন দেখেন তানপুরা নিয়ে কোন আকাশবাণীর কর্মী তার গলার স্বর শুনে সুর মেলাচ্ছেন। পুরুলিয়ার এমনি এক গ্রামীণ শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছিল — ''আমরা তো গুণী গায়েনের মত তানপুরা নিয়ে মাঠে বা গ্রামে গলা সাধি না।" তাছাড়া পুরুলিয়ার ঝুমার গানের সঙ্গত করার সময় সে মাদল না দেখতে পেয়ে খুব চটে গিয়ে বলেছিল —''পুরুলিয়া কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, যে মাদল আকাশবাণীতে স্থান পায় না।" অডিশন কর্তারা ঘাবড়ে গিয়ে অদৃশ্যস্থান থেকে বলেছিল— ''এবার থেকে পুরুলিয়ার ঝুমুরে মাদল রাখা হবে।" কিন্তু মাদল এলেও বাজাবে কে? বাদক তো পুরুলিয়া থেকে আনতে হবে। কিন্তু আজও মাদল ও মাদল - বাদক আকাশবাণীতে দেখতে পাওয়া যায়নি।

গ্রামীণ ভারতের অসংখ্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ যাঁরা গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তাঁরা নিজেদের আনন্দের জন্য গান বাঁধছেন, সুর দিচ্ছেন এবং গান গেয়ে লোকায়ত সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল রেখেছেন। এরা কোনদিনই আকশবাণীর 'অ্যাপ্রুভড্' শিল্পী বা গীতিকার নন। ঘটনাচক্রে এই সমস্ত গ্রামীণ গীতিকারদের গানকে যদি কোন শিল্পী আকশবাণী মারফৎ প্রচার করেন, তখন কিন্তু গীতিকারের বদলে প্রচার করা হয় ''প্রচলিত লোকগীতি" হিসাবে। গ্রামীণ ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির হাজার বছরের পুরোনো ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্যের অধিকাংশই গান। বিন্দিয়া সিং, বিরজুরাম, দুর্য্যোধন, নরোত্তমা, গৌরাঙ্গিয়া, পীতাম্বর, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিপিনবিহারী মুখী, গিরিশ মাহাতো, উদয় কর্মকার, দ্বিজ টিমা, সৃষ্টিধর, পদ্মলোচন প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষতাশালী কবি ও গীতিকার লৌকিক সুরকে কেন্দ্র করে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জনপদীয় সাহিত্যকে সজীব ও বহতা রেখেছেন। এরা ঝুমুরের গীতিকার, আকাশবাণীর নন। এরা সেখানে বহিরাগত। আর কোলকাতা শহরে বসে এই সমস্ত স্বনামধন্য কবিদের পংক্তির শব্দগুলি সামান্য হের ফের করে বাজারে চালাচ্ছেন যাঁরা তারাই শহরবাসীর কাছে সত্যিকারের ঝুমুকেরর গীতিকার। কোলকাতাবাসী শহর সংস্কৃতির মানুষ ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অপরিচয়ের দূরত্বে থাকার জন্য বেমালুম এই 'দু-নম্বরী' লোকগুলিকেই 'এক নম্বরী' ভাবছেন।

কোন লোকসঙ্গীতের form দীর্ঘদিন এক থাকতে পারে না। কিন্তু কোলকাতাতে বসে ''ভ্রমর বসে কাঁচা বাঁশে" কিংবা ''কইলকাতার বিটি ছাড়া" কিংবা ''মদনা ছঁড়া ধমসা বাজাছে টুসু ছুঁড়ি ধমসার বোলে কেমন দেখ নাচিছে" গানগুলি না ঝুমুর না টুসু গান। অথচ শহর সংস্কৃতির লোকেরা এঁদের ঝুমুর ও টুসুর Original গায়ক ও সুরকার ভাবলেন। এরা ঝাড়খণ্ডী মানুষের ভাষা জানে না, সুর চেনে না, উচ্চারণ - ভঙ্গি জানে না, জানে না টুসু বা ঝুমুর গান তাদের কত আদরের। পাঁজরার কুনকুনে বেদনার সঙ্গে এঁরা এগুলো ধরে রাখেন। 'টুসু' এদের লৌকিক দেবী এবং তাদের মা ও মেয়ের মতো। কিন্তু 'চক্রবর্তী' পদবিধারী জনৈক গীতিকার, সুরকার ও গায়কের বিশুদ্ধ ভজনাতে একটি প্রসিদ্ধ রেকর্ড বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে গেল স্থানীয় পত্র পত্রিকাতে লেখালেখি। তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়া সমগ্র ঝাড়খণ্ডীবাসী। হাজার কণ্ঠের সম্মিলিত কোরাস ''টুসু আমাদের জননী ও কন্যাসম সুতরাং এই গান বাজেয়াপ্ত হউক।"

ভাড়খণ্ডের তরুণ কবি ও সুরকার তথা ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক কৃত্তিবাস কর্মকার যখন তার স্বরচিত ঝুমুর নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান তখন কখন যে হাজার হাজার শ্রোতা তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নিজেদের অজান্তেই গলা মেলান, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পুরুলিয়া, বারিপাদা, ঝাড়গ্রাম, রাইপুর, দুর্গাপুর, ধানবাদ, রাঁচি, কলকাতা সর্বত্র তাঁর ঝুমুরেই যে বিপ্লবী প্রতিরোধ।

১.

আমাদের ঝাড়খণ্ডের মাটি
চিরজীবন রবে খাঁটি
আত্মদানে দাও অঙ্গীকার
একসাথে তুলে হাত, করে দিজ বাজীমাৎ
জাগাইব ঝাড়খণ্ড সমাজ।

২.

রঙ : এই সোনার ঝাড়খণ্ড আমার রে
(১) এই মাটিতে জন্ম মোদের, আজ ঘোল জেলা কার?
আগাম দিগাম ভাবে দেখ, সারা ভারতের সাররে
(২) পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অভাই এই সীমানা যায়

কিছু উড়্যা, কিছু বাংলা কিছু বিহারের
(৩) বড়বড় কলকারখানা লক্ষ লক্ষ কোয়াটার
পরদেশীরা চাকরী করে জমিনটা কাহাররে
(৪) অভ্র, তামা, পিতল বিজলী বাতির তার
মাটির ভিতর কাল সোনা হামদের নাই যে অধিকার রে

অন্যদিকে তরুণ কবি সুনীল মাহাতো টুসুর গানে লিখলেন :

সাঁওতালডি বিজলী কারখানা
কত বাবুদের আনা গোনা
কলকাতাতে বিজলী যাবেক
পুরুল্যার ট্যাঁড়ে ট্যাঁড়ে
বাতি জ্বলবেক কলকাতাই
আর হামারা রইব আঁধার
এই তো বাবুদের বিচার।

তিনি ঝুমুর গান লিখলেন :

(১) বেঙ্গলা বলে তুঁই লছট
বিহার বলে দুর হটো
রঙ: পুরুল্যা কি ঝাঁপ দিবেক জলে
বাঙালী ভাই, বিহারী ভাই
দেনটুকু বলে।
(২) পাহাড়ে জঙ্গলে খেরা
তাও কেনে সর্বহারা
কারখানায় কারখানা চলে
(৩) খাপরা পিঠা খরাঁই গেল
চিপে চাইপে মর‍্যাই এত দিল
সুনীলে কি পেঁদা কথা বলে।

আরও একজন প্রতিভাবান তরুণ কবি ও গায়ক হাজারী রাজোয়াড় । তিনি আরও তীব্র প্রতিবাদে মুখর:

উড়িষাতে লয় উড়িয়া, পশ্চিমেতে লয় পছিয়া
বাংলাতে লয় যদি বাঙ্গালী হে
রঙ: হামরা কি উপরলে টপকিলি
তরাই সকল বাঁইটে সারে লিলি হে।
হামদের শাল হামদের লঢ়া
হামাদের ভাঙ্গলি দাঁতের গড়া
হাতে টুপা পথে বসাঁই দিলি হে
হামরা কি উপরলে টপকিলি ...

এমনিভাবে কবি সদানন্দ মাহাত, বিজয় মাহাত, বিশ্বনাথ মুখার্জী, তারিণী আচার্য, পবন মাহাত, সুখদেব মুণ্ডা, সুগনা পাহান, রঘুনাথ জেরাই, সচ্চিদানন্দ লাল সাহ দেও প্রমুখেরা হাজারে হাজারে গান লিখছেন, সুর দিচ্ছেন।

আর কণ্ঠের সুমধুর স্বরে, মাদলের তালে, সে সমস্ত ঝাড়খণ্ডী গায়ক গায়িকা ঝাড়খণ্ডের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে শহরে মাধ্যমগুলির নেতিবাচক ভুমিকাকে শিমুল তুলোর মতো উড়িড়ে ঝাড়খণ্ডী লোকসঙ্গীতের প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তাঁরা হলেন — গোলাপী মাহাতো, কৃত্তিবাস কর্মকার, বিজয় মাহাতো, ধনঞ্জয় মাহাতো, রামকৃষ্ণ ভঞ্জদেও, সুরুপা চক্রবর্তী, প্রদীপ কুমার সিংদেও, বীণাপাণি মাহান্ত, অঞ্জলি মাহাতো, হাজারী রাজোয়াড়, সদানন্দ মাহাত, পবন মাহাতো, রামদয়াল মুণ্ডা, অর্জুন হেসা, মদন জেরাই, কর্মবীর মাহাতো, রাখহরি মাহাতো, মঙ্গল সরেন, সামধন পিঙ্গুয়া, কার্ত্তিক সিংমুড়া প্রমুখ অসংখ্য শিল্পী।

উপসংহার

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আজ ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অর্ধ - সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিক চক্রান্তের শিকার। অভ্যন্তরীণ পুঁজিপতি চক্রের সাহয্যে আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ভিত শক্ত করতে চাইছেন নানা উপায়ে। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষেরা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের খোলস ছেড়ে যে আঞ্চলিক স্বাধিকারবোধের কথা ভাবছেন তা আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে। বিপ্লবী চেতনার দর্শনে ও মানুষের জনগণতান্ত্রিক সম্মিলিত প্রয়াসে শহরের নেতিবাচক মাধ্যমগুলিকে কার্যত তারা অস্বীকার করে নিজস্ব উৎকর্ষতাকে ও মতাদর্শকে তাঁরা জনগণের সামনে পৌঁছে দিচ্ছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাসই বলবে যে তারা সঠিক বিপ্লবী পথ নিয়ে ছিল কিনা।

সৌজন্যে : শৈলেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ‘মধ্যাহ্ন’, বিশেষ উপজাতি সমাজতত্ত্ব সংখ্যা -১, অক্টোবর’ ৮৩।